বাংলাদেশ ও বিশ্বঅর্থনীতি

ইউনিট-৭

Bangladesh and Global Economy

ভূমিকা

বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের অন্তর্ভুক্ত দরিদ্রতম দেশগুলোর একটি। দু:খজনক হলেও সত্য পৃথিবীর কাছে বাংলাদেশের পরিচয় ক্ষুধা, দারিদ্র এবং প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বিপর্যস্ত একটি রাষ্ট্র হিসাবে। ১৯৭১ সালে রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতা যুদ্ধের মধ্য দিয়ে রাজনৈতিকভাবে স্বাধীন একটি ভূখন্ড লাভ করলেও এ অঞ্চলের জনগোষ্ঠী এখনো পর্যন্ড় অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জনে সক্ষম হয় নি। এমনকি অর্থনৈতিক মুক্তি লাভের পথে আমরা জোরালো পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পেরেছি তাও বলা যায় না। অথচ স্বাধীনতার পর থেকে সকল সরকারের পক্ষ থেকেই উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচনের বহুবিধ কর্মসূচী গৃহীত হয়েছে। কিন্তু বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কাঙ্খিখত সাফল্য অর্জনে ব্যর্থতা কতগুলো প্রশ্ন সামনে নিয়ে এসেছে।

প্রথমত: প্রচলিত উন্নয়ন ধারণা চর্চা করার মাধ্যমে কাঙ্খিত অর্থনৈতিক মুক্তি লাভ আদৌ সম্ভব কিনা?

দ্বিতীয়ত: মৌলিক সমস্যাগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে কি?

তৃতীয়ত: যদি মৌলিক সমস্যাগুলো চিহ্নিত করা হয়ে থাকে তবে সে সমস্যাগুলো নিরসনের জন্য যথাযথ পদক্ষেপ কেন নেয়া সম্ভব হচ্ছে না? উন্নয়ন যদিও একটি বহুমুখী ধারণা। কোন একটি বিশেষ ক্ষেত্রের সফলতা বিচার করে 'উন্নয়ন'কে অনুধাবন করা সম্ভব নয়। তথাপি এ কথা সত্য যে, অর্থনৈতিক দিক থেকে উন্নততর অবস্থানে পৌছানো উন্নয়নে'র অন্যতম গুরুত্বপূণ শর্ত।

এই ইউনিটে পাঁচ (৫) টি পাঠ আলোচনা করা হয়েছে। এগুলো হচ্ছে -

- *পাঠ- ১* *বাংলাদেশের মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যাবলী।*
- *পাঠ- ২* *অর্থনৈতিক পরিকল্পনার গুরুত্ব।*
- *পাঠ- ৩* *বাজেট।*
- *পাঠ- ৪* *মিশ্র ও মুক্ত বাজার অর্থনীতি।*
- *পাঠ- ৫* *বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থা।*

পাঠ - ১ বাংলাদেশের মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যাবলী
Basic Economic Problems in Bangladesh

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি —

- বাংলাদেশের অর্থনীতিতে পশ্চাদপদ অবস্থানের ঐতিহাসিক ও বর্তমান কারণসমূহ আলোচনা করতে পারবেন।
- বাংলাদেশের মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যাসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।
- অর্থনৈতিক সমস্যা থেকে উত্তরণের উপায় চিহ্নিত করতে পারবেন।

পশ্চাদপদ অবস্থানের কারণ

বাংলাদেশের অর্থনীতির বিদ্যমান দুরাবস্থা হঠাৎ করে তৈরি হয় নি বরং এর সাথে জড়িত আছে ঐতিহাসিক বিভিন্ন কারণ। সাম্প্রতিক সময়ের বিভিন্ন অব্যবস্থাও অর্থনীতির ক্ষেত্রে দুর্বল অবস্থা তৈরিতে ভূমিকা রাখছে।

ঔপনিবেশিক শাসন

১৯৭১ সালে স্বাধীনতা লাভের পূর্বে বাংলাদেশ দুইশত বছরের বেশি সময় ঔপনিবেশিক শক্তি দ্বারা শাসিত হয়। ইংরেজ আমল এবং ১৯৪৭ পরবর্তী পাকিস্তান আমল উভয় সময়কালে ঔপনিবেশিক প্রভুদের মূল লক্ষ্য ছিল এ অঞ্চল থেকে সম্পদ লুণ্ঠনের মাধ্যমে নিজেদের দেশকে সমৃদ্ধ করে তোলা। ঔপনিবেশিক শাসন তার চরিত্র অনুসারেই উপনিবেশের উন্নয়নের পরিবর্তে লুণ্ঠনী মনোবৃত্তি দ্বারা পরিচালিত হয়। ইংরেজ শাসন শেষে পাকিস্তানী শাসনেও পূর্ব বাংলার জনগণের প্রতি চূড়ান্ত বৈষম্য প্রদর্শন করা হয়। ব্যাপক লুণ্ঠন প্রক্রিয়ার প্রতিক্রিয়ায় স্বাধীনতা যুদ্ধের মধ্য দিয়ে যে ভূখন্ড অর্জিত হয় তার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে-ব্যাপক পুঁজির সংকট, অবকাঠামো সমস্যা ইত্যাদি। অথচ এগুলোই অর্থনৈতিক উন্নয়নের মৌলিক পূর্বশর্ত।

বাংলাদেশের অর্থনীতির বর্তমান দুরাবস্থা হঠাৎ করে তৈরী হয় নি। বরং এর পেছনে বুহুবিধ ঐতিহাসিক কারণ বিদ্যমান রয়েছে।

রাজনৈতিক নেতৃত্বের ব্যর্থতা

কোন একটি রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম শর্ত যোগ্য রাজনৈতিক নেতৃত্ব। যে নেতৃত্ব সঠিক দিক নির্দেশনা এবং প্রয়োজনে কঠোর অথচ যৌক্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম। বাংলাদেশের মত একটি দুর্বল অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্য-সাহসী রাজনৈতিক নেতৃত্বের অনুপস্থিতি অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যর্থতার ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা রাখছে। এছাড়াও প্রধান রাজনৈতিক শক্তিগুলোর মধ্যে কতিপয় মৌলিক ইস্যুতে দ্বন্দ্ব থাকার কারণে ঐক্যমত্য প্রতিষ্ঠা হচ্ছে না। অথচ যে কোন রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক সাফল্য লাভের জন্য রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা একান্ত প্রয়োজন।

বিদেশী সাহায্য নির্ভরতা

স্বাধীনতার পর থেকে বাংলাদেশ বিভিন্ন ধরনের কোটি-কোটি ডলার বৈদেশিক সাহায্য পেয়েছে। অথচ কাঙ্খিত অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জন এবং একটি স্বনির্ভর অর্থনীতি গড়ে তোলা সম্ভব হচ্ছে না। এর পরিবর্তে প্রতিনিয়ত বাংলাদেশের বিদেশী সাহায্য নির্ভরতা বেড়ে চলেছে (সরকারী এবং বেসরকারী পর্যায়ে)। এমতাবস্থায় অনেক অর্থনীতিবিদ মনে করছেন, বিদেশী সাহায্যের উপর নির্ভরশীল থেকে প্রকৃত অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জন অসম্ভব। এছাড়াও বিদেশী সাহায্যের যথাযথ ব্যবহারের ক্ষেত্রেও অনেক সময় সন্দেহের অবকাশ থাকে।

পুঁজি এবং উদ্যোক্তা সংকট

পূর্বে আলোচিত ঐতিহাসিক কারণে (ঔপনিবেশিক শাসন) বাংলাদেশে প্রথম থেকেই প্রয়োজনীয় পুঁজির সমস্যা ছিলো। এ সাথে পুঁজি পাচার ও রাষ্ট্রীয় পুঁজির যথার্থ ব্যবহার না ঘটায় অর্থনীতির

ক্ষেত্রে সংকট প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাছাড়া 'বাজার অর্থনীতি' ব্যবস্থায় দক্ষ ও সাহসী উদ্যোক্তা না থাকলে অর্থনৈতিক উন্নয়নে গতি আসে না। বাংলাদেশে প্রাইভেট সেক্টরের পুঁজি বিনিয়োগকারীরা দীর্ঘমেয়াদী পুঁজি লগ্নীর, পরিবর্তে ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে দ্রুত মুনাফা লাভে অধিক আগ্রহী। এ কারণে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে স্থিতিশীলতা আসছে না।

বাংলাদেশের মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা

মূলধন সমস্যা

যে কোন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে মূলধনের যোগান অন্যতম শর্ত। কেন না পুঁজি বা মূলধনের অভাবে সরকারের পক্ষে প্রয়োজনীয় কর্মসূচী গ্রহণ বা বাস্ড়বায়ন করা সম্ভব হয় না। বাংলাদেশেও পুজিঁ সংকটের কারণে অর্থনৈতিক পূনর্গঠনের জন্য পদক্ষেপগুলো নেয়া প্রায়শ:ই সম্ভব হয় না। তাছাড়া রাষ্ট্রীয় পুঁজি ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিভিন্ন অব্যবস্থা রয়েছে। এ প্রসঙ্গে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর বিভিন্ন খাতওয়ারী বরাদ্দ আলোচনা করা হল।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর বিভিন্ন খাতওয়ারী বরাদ্দ ১৯৯৬-৯৭ (অংকসমূহ কোটি টাকায়)

- কৃষি-৭৪৮.৭০
- পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান-৯৭৪.৬৩
- বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও পানিসম্পদ -১০২১.৩১
- শিল্প - ১৮৫.০৭
- বিদ্যুৎ -১৩০৮.১৫
- পরিবহন-২৪৪০.১৫
- জনসংখ্যা ও পরিবার পরিকল্পনা-৩৯১.৯৫
- তেল, গ্যাস ও প্রাকৃতিক সম্পদ- ৪৭৯.৫২
- বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী গবেষণা -৬০.০২

নিু মাথাপিছু আয়

বাংলাদেশের জনগণের মাথাপিছু আয় অত্যন্ত নিম্ন। এই নিু আয়ের দ্বারা অধিকাংশ লোকই জীবন ধারণের ন্যূনতম শর্ত পূরণ করতে পারে না। মানুষের মৌলিক চাহিদা মেটানো এখন পর্যন্ত রাষ্ট্রের পক্ষে সম্ভব হয় নি। এমতাবস্থায় অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ের হারও অত্যন্ত নিম্ন। শতকরা মাত্র ৫-৭ ভাগ। এধরনের নিম্ন সঞ্চয়ের হার অর্থনৈতিক গতিশীলতা আনয়নে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগের যোগান দিতে পারে না।

ক্ষুদ্র অভ্যন্ড়রীণ বাজার

ক্ষুদ্র অভ্যন্ড়রীণ বাজার, মূলধন সমস্যা, তদুপরি নিু মাথাপিছু আয়ের কারণে বাংলাদেশের অভ্যন্ড়রীণ বাজার শক্তিশালী হতে পারছে না। একদিকে বিভিন্ন প্রতিকূল শর্তের ফলে দেশীয় পণ্যের উচ্চমূল্য অন্যদিকে জনগণের ক্রয় ক্ষমতার অভাবে দেশের ভেতরে একটি শক্তিশালী বাজার গড়ে উঠছে না। তার পরির্বতে বিদেশী পণ্যের তুলনামূলক সস্তা দাম হওয়ায় দেশীয় শিল্প বিকাশে বাঁধা তৈরী হচ্ছে।

বাংলাদেশ কৃষি নির্ভর একটি দেশ। এদেশের প্রকৃত অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য একটি শক্তিশালী কৃষিখাত এখনো একান্ড় প্রয়োজনীয়।

কৃষিখাতে অব্যবস্থা

বাংলাদেশ কৃষি নির্ভর একটি দেশ। এদেশের প্রকৃত অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য একটি শক্তিশালী কৃষিখাত এখনো একান্ত প্রয়োজনীয়। যদিও জাতীয় অর্থনীতিতে কৃষির অবদান প্রতি বছর কমছে তবুও কৃষিখাতের সফলতা পরবর্তীতে শিল্প খাতের বিকাশকে ত্বরান্বিত করবে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য কৃষিখাতের বিকাশ আরো প্রয়োজন এ কারণে যে, জনগোষ্ঠির সর্ববৃহৎ অংশ এখনো কৃষিখাতে নিয়োজিত।

প্রাকৃতিক বিপর্যয়

ভৌগলিক অবস্থানগত কারণে বাংলাদেশ প্রতি বছর বন্যা, খরা, জলোচ্ছাসজনিত প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের শিকার হয়। নিয়মিত প্রাকৃতিক দুর্যোগ বাংলাদেশের অর্থনীতিতে গুরুতর সমস্যা সৃষ্টি করেছে। দুর্যোগ জনিত ক্ষয়ক্ষতির ফলে একদিকে মানব সম্পদের ব্যাপক ঘাটতি তৈরী হয়। অন্যদিকে ক্ষতিগ্রস্ড়দের পুণর্বাসনের জন্য প্রচুর পরিমাণ নগদ অর্থ ব্যয় হয়।উপরোক্ত সমস্যাগুলো ছাড়াও আরো কিছু বিষয় উলে- খ করা যায় যেগুলো বাংলাদেশের অর্থনীতিতে সমস্যা তৈরী করছে। যেমনঃ খাদ্য ঘাটতি, নিু শিক্ষা হার, দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি, দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি, ধর্মীয় ও সামাজিক অনুশাসন।

সমস্যা থেকে উত্তরণের উপায়

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বিদ্যমান মৌলিক সমস্যাবলী থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে নিুলিখিত কর্মসূচী গ্রহণ করা যেতে পারে-

মানব সম্পদ উন্নয়ন ও মানব উন্নয়ন

বর্তমানে তথাকথিত উন্নয়নের নামে মানুষকে শোষণ ও বঞ্চনার দর্শন ত্যাগ করা হয়েছে।মানব সম্পদ উন্নয়ন বলতে আমরা বুঝি জনগোষ্ঠীর দক্ষতার উন্নয়ন। অন্যদিকে মানব উন্নয়নের প্রধান তিনটি নির্দেশক চিহ্নিত করা হয়: জন্মের সময় প্রত্যাশিত আয়ু, স্বাক্ষরতা বা জ্ঞানবুদ্ধি এবং গড় আয়। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে গতিশীলতা তৈরি করতে হলে উভয় ক্ষেত্রে জোরালো পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

বিদেশী সাহায্য নির্ভরতা হ্রাস

অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা অন্যতম পূর্বশর্ত।

একথা এখন প্রমাণিত যে, বিদেশী সাহায্য নির্ভর হয়ে কোন রাষ্ট্রের পক্ষেই সম্পূর্ণ ভাবে অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জন অসম্ভব। বরং দীর্ঘস্থায়ী নির্ভরশীলতা তৈরীর সম্ভাবনা থাকে। যদিও হঠাৎ বিদেশী সাহায্য পরিহার করলে অর্থনীতিতে বিপর্যয় নেমে আসতে পারে। তথাপি বাংলাদেশের প্রকৃত উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হলে বিদেশী সাহায্য নির্ভরতার পরিমাণ ক্রমাগত কমিয়ে আনতে হবে।

দেশী পণ্যের বাজার

বাংলাদেশে বর্তমানে ‘বাজার অর্থনীতি’ ব্যবস্থা অনুসরণ করা হচ্ছে। কিন্ত বাজার অর্থনীতির নামে দেশীয় বাজার সম্পূর্ণভাবে বিদেশী পণ্যের হাতে ছেড়ে দিলে, দেশী পণ্যের শক্তিশালী বিকাশ ঘটে না, উদ্যোক্তারা উৎসাহ হারায় এবং জাতীয় স্বার্থবাহী উন্নয়ন হয় না। তাই অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি বড় শর্ত বাজার অর্থনীতি ব্যবস্থার মধ্যে থেকেও দেশীয় পণ্যের বাজার নিশ্চিত করা।

রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা

প্রধান রাজনৈতিক শক্তিগুলো যদি মৌলিক ইস্যুগুলোতে ঐকমত্যে পৌছাতে না পারে সে ক্ষেত্রে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা তৈরী হয়।

এ ছাড়া রাজনৈতিক প্রতিহিংসার ফলে স্থিতিশীলতা নষ্ট হয় অথচ অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা অন্যতম পূর্বশর্ত। সেজন্য অর্থনৈতিক মুক্তি যদি নিশ্চিত করতে হয় সে ক্ষেত্রে বাংলাদেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা তৈরী করা প্রয়োজন।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমস্যা উত্তরণের জন্য আরো কিছু উপায় উল্লেখ করা হলো, যেমন- কৃষি ও শিল্প খাতের বিকাশ, প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ ব্যবহার, দ্রুত শিক্ষা বিস্তার, যোগাযোগ ও পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নতি।

কৃষি আধুনিকীকরণ

বাংলাদেশের শ্রমশক্তি অধিকাংশই কৃষিখাতে নিয়োজিত। গ্রামীণ জনগণের আয়ের প্রধান কৃষি। এদেশে কৃষি ব্যবস্থা এখনো আধুনিক পদ্ধতিতে চাষাবাসের পরিবর্তে প্রথাগত পদ্ধতির উপর নির্ভরশীল। অথচ জনসংখ্যার চাপ প্রচন্ডভাবে বৃদ্ধির কারণে কৃষি উৎপাদন ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পাওয়া

প্রয়োজন। তাছাড়া কৃষিখাত শক্তিশালী না হলে শিল্পখাতের উন্নয়ন অসম্ভব। এ সব কারণে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে চাষাবাস, ভূমি ব্যবস্থা সংস্কার এবং উন্নত উপকরণ ব্যবহারের উপায় নিশ্চিতও করে কৃষিখাতের আধুনিকীকরণ করা একান্ড়প্রয়োজন।

শিল্পবিকাশ

শিল্পখাতের বিকাশ ছাড়া আধুনিককালে কোন রাষ্ট্রের পক্ষেই উন্নয়ন সম্ভব হয় না। বাংলাদেশে শিল্পখাতের উন্নয়নের গতি অত্যন্ত মন্থর। গার্মেন্টস, চামড়া ও অন্যান্য কয়েকটি খাতে উন্নয়ন হলেও এগুলোকে মৌলিক শিল্পোন্নয়ন বলা যায় না। কাঁচামাল, প্রযুক্তি, পুঁজি ও দক্ষতার অভাবে ভারী শিল্প বিকশিত হচ্ছে না। বাংলাদেশের উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হলে শিল্পখাতের বিকাশে জন্য সরকারি ও বেসরকারি উভয় পর্যায়েই দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

প্রাকৃতিক সম্পদ

প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ ব্যবহার উন্নয়নের জন্যে অপরিহার্য। তেল, গ্যাস, কয়লাসহ যে সব প্রাকৃতিক সম্পদ বাংলাদেশে রয়েছে সেগুলো উত্তোলন এবং ব্যবহারের ক্ষেত্রে দেশের স্বার্থ যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে হবে। পুঁজির অভাবে প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণে বিদেশী সহায়তা প্রয়োজন হয়। কিন্তু ন্যায্য হিস্যা নিশ্চিত না হলে বাংলাদেশ প্রাকৃতিক সম্পদের সুফল থেকে বঞ্চিত হবে। অমূল্য প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করে, উন্নয়ন প্রক্রিয়া জোরদার করতে রাষ্ট্রকে অধিক তৎপর হতে হবে।

সারকথা: *সুদীর্ঘ ঔপনিবেশিক শাসন, রাজনৈতিক নেতৃত্বের ব্যর্থতা, পুঁজি এবং উদ্যোক্তা সংকট, পুঁজি পাচার ও রাষ্ট্রীয় পুঁজির অপব্যবহার ইত্যাদি কারণে বাংলাদেশ অর্থনৈতিকভাবে পশ্চাৎপদ অবস্থানে রয়েছে। এছাড়াও নিু মাথাপিছু আয়, ক্ষুদ্র অভ্যন্ড়রীণ বাজার, কৃষিখাতে অব্যবস্থা, প্রাকৃতিক বিপর্যয়জনিত সমস্যা এবং মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা মোকাবিলা করতে হচ্ছে বাংলাদেশকে। মানব সম্পদ উন্নয়ন ও মানব উন্নয়ন খাতে অধিক বিনিয়োগ, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা আনয়ন, বিদেশী সাহায্য নির্ভরতা হ্রাস, কৃষি ও শিল্পখাতের উপযুক্ত বিকাশ ঘটিয়ে সমস্যা থেকে উত্তরণ সম্ভব। সুতরাং দ্রুত এ পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করে বাংলাদেশকে দ্রুত উন্নয়নের পথে নিয়ে যাওয়া দরকার। এর ফলে এ দেশের মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তিও আসবে।*

পাঠোত্তর মুল্যায়ন
নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন
সঠিক উত্তরটি লিখুন।

১. ব্রিটিশ এবং পাকিস্তানী উপনিবেশিক শাসনামলে বাংলাদেশের অর্থনীতির কি অবস্থা হয় ?
   ক) ব্যাপক সমৃদ্ধি আসে।
   খ) জনগণের মাথা পিছু গড় আয় বৃদ্ধি পায়;
   গ) শাসকরা এ অঞ্চলের উন্নয়নে মনোনিবেশ করে ;
   ঘ) পূর্ব বাংলা থেকে যত বেশী সম্পদ লুণ্ঠন করা হয়।

২. বাংলাদেশে বিদেশী সাহায্য নির্ভরতার কারণে কি হচ্ছে?
   ক) নির্ভরতার পরিমাণ ক্রমাগত কমছে;
   খ) অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হচ্ছে;
   গ) অর্থনীতি ক্রমাগত বিদেশী সাহায্য নির্ভর হয়ে পড়ছে;
   ঘ) অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জিত হয়েছে।

৩ বাংলাদেশের জনগণের মাথাপিছু আয় কত?
   ক) উন্নত দেশসমূহের সমান;
   খ) অত্যন্ত উচ্চ;
   গ) কোন হিসাব নেই;
   ঘ) অত্যন্ড়নিু।

৪. মূলধন ঘাটতি থাকার ফলে বাংলাদেশে-
   ক) সরকার প্রয়োজনীয় কর্মসূচী গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে পারে না;
   খ) জনগণ রাষ্ট্রের ঘাটতি পুরণ করে;
   গ) অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা তৈরী হচ্ছে;
   ঘ) বৈদেশিক সাহায্য নির্ভরতা

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. বিদেশী সাহায্য নির্ভরতা কেন হ্রাস করা প্রয়োজন ?
২. অর্থনৈতিক উন্নয়নে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার গুরুত্ব কি?

রচনামুলক প্রশ্ন

১. বাংলাদেশের মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যাগুলো আলোচনা করুন।

উত্তরমালাঃ ১.ঘ, ২.গ, ৩.ঘ, ৪.ক

সহায়ক গ্রন্থ

১. *এম.এম. আকাশ, 'বাংলাদেশের উন্নয়ন; ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিত ও সম্ভাবনা' (১৯৯১)*

অর্থনৈতিক পরিকল্পনার গুরুত্ব

পাঠ - ২

Importance of Economic Planning

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি —

- অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বলতে কি বুঝায় তা বুঝতে পারবেন।
- অর্থনৈতিক পরিকল্পনার গুরুত্ব আলোচনা করতে পারবেন।
- বাংলাদেশে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার প্রাসঙ্গিঁকতা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

অর্থনৈতিক পরিকল্পনা

বর্তমান পৃথিবীতে রাষ্ট্রসমূহের কোনটিই সম্পদের দিক থেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়, মূলতঃ কোন রাষ্ট্রের পক্ষেই সকল দিক থেকে স্বয়ং সম্পূর্ণ হওয়া সম্ভবও নয়। দরিদ্র রাষ্ট্রগুলোর ক্ষেত্রে এ কথা আরো বেশী ভাবে সত্য। অথচ এদের প্রত্যেককেই স্বল্পতম সময়ের মধ্যে অধিকতর অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য কর্মসূচী গ্রহণ করতে হয়। এমতাবস্থায় অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণ একান্ত আবশ্যিক। অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বলতে সাধারণতঃ এমন একটি পদ্ধতি অনুসরণ করা বুঝায় যার মাধ্যমে কোন একটি দেশের সম্পদের যথার্থ ব্যবহার ঘটবে এবং জনসাধারণের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পাবে। অর্থনীতিবিদ ডিকেনসন (Dickenson) এর মতে, অর্থনৈতিক পরিকল্পনা হচ্ছে একটি সুনিদিষ্ট কর্তৃপক্ষের সচেতন সিদ্ধান্ড় যা সামগ্রিক ভাবে অর্থ ব্যবস্থাকে ব্যাপকভাবে জরিপ করার মাধ্যমে কোন দ্রব্য কি পরিমাণে উৎপাদিত হবে এবং বন্টিত হবে সে সম্পর্কে নিদের্শনা প্রদান করবে। বারবারা উটন (Barbara Wooton)'র ধারণা অনুসরণ করে বলা যায়, সরকারী কর্তৃপক্ষের দ্বারা সুচিন্তিত এবং সুবিবেচিত অর্থনৈতিক গুরুত্বাবলীর নির্বাচনই অর্থনৈতিক পরিকল্পনা। বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করে এর কয়েকটি বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করা হল।

প্রথমতঃ পরিকল্পনা হবে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যভিত্তিক, সচেতন এবং স্বতঃস্ফূর্ত।

দ্বিতীয়তঃ অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রণয়ন, সমন্বয় এবং বাস্তবায়নের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ থাকবে।

পরিকল্পনা হবে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ভিত্তিক, সচেতন এবং স্বতঃস্ফূর্ত।

তৃতীয়তঃ অর্থনৈতিক পরিকল্পনা সীমিত সম্পদের যৌক্তিক ব্যবহার নিশ্চিত করবে।

অর্থনৈতিক পরিকল্পনার গুরুত্ব

অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গুরুত্বপূর্ণ এ কারণেই যে, এ হচ্ছে এমন একটি ব্যবস্থা যার মাধ্যমে সীমিত সম্পদের যথাযথ ব্যবহারের ফলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে গতিশীলতা আসে এবং অধিকতর কল্যাণমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায়। অর্থনৈতিক পরিকল্পনার গুরুত্ব সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হল:

- অর্থনৈতিক পরিকল্পনার অনুপস্থিতিতে রাষ্ট্রে বিদ্যমান বৈষম্য হ্রাস পাওয়ার পরিবর্তে বৃদ্ধি পেতে থাকে। ফলে অস্থিতিশীলতা তৈরী হয়। মানুষের মধ্যে বৈষম্যের বোধ যত বেশী প্রবল হতে থাকে বিশৃং খলা এবং সংঘাত তত বৃদ্ধি পায়।

যথার্থ অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়।

- সুষ্ঠু অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হলে উৎপাদকের স্বার্থ নিশ্চিত হতে পারে এবং একচেটিয়া মুনাফা জমা হওয়ার প্রবণতা তৈরী হতে পারে না।
- যথার্থ অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়। অন্যদিকে পরিকল্পনাহীন অর্থনীতিতে সম্পদের অপচয় এবং অপব্যবহার ঘটে।
- দরিদ্র রাষ্ট্রগুলোতে বিদ্যমান পুঁজি সংকট অর্থনৈতিক পরিকল্পনা দ্বারা মোকাবেলা সম্ভব হয়।
- দরিদ্র রাষ্ট্রগুলোর মূলধন ও দক্ষতার অভাব থাকে। একই সাথে অভ্যন্ড়ীণ বাজার দুর্বল থাকার কারণে প্রায়শঃই উন্নয়নের ক্ষেত্রে কাঙ্খিত গতি সঞ্চার করা সম্ভব হয় না। যথাযথ অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বাস্ড়বায়ন করা সম্ভব হলে পূর্বোক্ত সমস্যাগুলো বহুলাংশে মোকাবেলা করা যায়।

বাংলাদেশ এবং অর্থনৈতিক পরিকল্পনার প্রাসঙ্গিকতা

বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের একটি দেশ। প্রায় ছাপান্ন হাজার বর্গমাইল আয়তনের মধ্যে বারো কোটি মানুষের বাস। জনসংখ্যার ঘনত্বের দিক থেকে এ হার বিশ্বে সর্বোচ্চ। জনসংখ্যার অর্ধেকের বেশী দারিদ্র্য সীমার নীচে বসবাস করে। শিক্ষার হার, স্বাস্থ্য সেবার মান, প্রয়োজনীয় খাদ্য গ্রহণের ক্ষমতা, যে কোন মানদন্ডের বিচার করা হোক না কেন- বাংলাদেশের অবস্থা অত্যন্ড় উৎকণ্ঠাজনক। সে সাথে রয়েছে প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি যা কৃষিনির্ভর বাংলাদেশের ফসল উৎপাদনকে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ড় করে। প্রয়োজনীয় মূলধনের অভাবে কৃষি কিংবা শিল্পখাতের কোনটিই তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে বিকশিত হতে পারছে না। এ সমস্ড় হতাশা ব্যঞ্জক পরিস্থিতির সাথে যুক্ত হয়েছে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, দুর্নীতিগ্রস্ত প্রশাসন এবং বৈদেশিক সাহায্য নির্ভর অর্থনীতি। এমতাবস্থায় বাংলাদেশ রাষ্ট্রকে যদি উন্নয়নের কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জন করতেই হয়, তাহলে একটি সুষ্ঠু-সুচিন্তিত সুষম অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা জরুরি। নিেু বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার প্রাসঙ্গিঁকতা আলোচনা করা হলো।

বাংলাদেশ রাষ্ট্রকে যদি উন্নয়নের কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জন করতেই হয়, তাহলে একটি সুষ্ঠু-সুচিন্ড়িত সুষম অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা জরুরী।

জাতীয় সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার করা ব্যতীত কোন রাষ্ট্রের পক্ষেই উন্নত হওয়া অসম্ভব। বাংলাদেশে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা সুষ্ঠু ভাবে চর্চা না হওয়ার ফলে জাতীয় সম্পদের যথেচ্ছ ব্যবহার ঘটতে দেখা যায়। এই প্রবণতা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বন্ধ করতে হলে নিরপেক্ষ অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে হবে।

মাথাপিছু আয়ের দিক থেকে বিচার করলে বাংলাদেশের স্থান দরিদ্র রাষ্ট্রগুলোর মধ্যেও একে বারে নীচের দিকে। অধিকাংশ জনগণ ব্যাপক দারিদ্র্যের মধ্যে জীবনধারণ করছে। জনকল্যাণমুখী অর্থনৈতিক পরিকল্পনা জনগণের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি এবং জীবন যাত্রার মান উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে-এ আশা করা অন্যায় নয়।

তৃতীয় বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্রের ন্যায় বাংলাদেশও মূলধন সংকটে জর্জরিত। প্রয়োজনীয় মূলধনের অভাবে জাতীয় কিংবা আঞ্চলিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ অধিকাংশ প্রকল্পই সরকারের পক্ষে বাস্ড়বায়ন করা সম্ভব হয় না। সুষ্ঠু অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করার মাধ্যমে বিদ্যমান মূলধন সংকট মোকাবেলা করা সম্ভব হবে।

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে আয়ের ক্ষেত্রে বৈষম্য প্রতিনিয়তই বৃদ্ধি পাচ্ছে। একদিকে স্বল্প সংখ্যক লোকের অত্যধিক সম্পদ বৃদ্ধি অন্যদিকে বৃহত্তর জনগোষ্ঠী ক্রমাগত অধিকতর দারিদ্র্যের শিকার হচ্ছে। একটি রাষ্ট্র ব্যবস্থায় এমন অবস্থা দীর্ঘস্থায়ী হতে থাকলে অস্থিতিশীলতা এবং সংঘাত সৃষ্টির সম্ভাবনা থাকে। এ অবস্থায় সকল স্তরের জনসাধারণের স্বার্থ রক্ষাকারী অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

বাংলাদেশের অর্থনীতি দীর্ঘদিন যাবৎ ক্রমাগত বিদেশী সাহায্য নির্ভর হয়ে পড়েছে। সরকারী এবং বেসরকারী উভয় পর্যায়ের উন্নয়ন প্রক্রিয়াই একান্তভাবে বিদেশী সাহায্য নির্ভর। এধরনের নির্ভরশীল অর্থনীতির পক্ষে কোন ক্রমেই উন্নয়ন প্রক্রিয়া বাস্ড়বায়ন কিংবা দারিদ্র্য বিমোচন সম্ভব নয়। আবার আমাদের অর্থনীতিতে নির্ভরশীলতার মাত্রা যত বৃদ্ধি পাচ্ছে বিদেশী সাহায্যের পরিমাণ তত কমে আসছে। সুচিন্ড়িত এবং সুদূর প্রসারী অর্থনৈতিক পরিকল্পনা যদি গ্রহণ করা না হয় তাহলে একবিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশের অর্থনীতি বিপর্যস্ত হয়ে পড়ার সম্ভাবনা আছে।

বাংলাদেশের সুষম অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য একটি সুষ্ঠু জাতীয় স্বার্থ রক্ষাকারী অর্থনৈতিক পরিকল্পনার আবশ্যক। যে পরিকল্পনার মাধ্যমে কৃষি ও শিল্প খাতের উন্নয়ন আসবে। দেশীয় উৎপাদিত পণ্যের বাজার নিশ্চিত হবে এবং বিদেশের বাজারে প্রতিযোগিতা করার মত মান এবং দাম সম্পন্ন পণ্য তৈরী করা সম্ভব হবে।

সারকথা: *কোন রাষ্ট্রই সম্পদের দিক স্বয়ং সম্পূর্ণ নয় বিধায় পরিকল্পনার উপর নির্ভর করতে হয়। কোন আধুনিক রাষ্ট্রই পরিকল্পনাহীন চলতে পারে না। দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রধান কাম্য বিষয় বলে দরিদ্র রাষ্ট্রগুলোকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপর অধিকতর গুরুত্ব দিতে হয়। কারণ অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মাধ্যমে, সীমিত সম্পদের যথাযথ ব্যবহার করে প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে গতিশীলতা আনয়ণ এবং কল্যাণমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ সম্ভব হয়। অর্থনৈতিক পরিকল্পনা না থাকলে রাষ্ট্রে বৈষম্য বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং অস্থিতিশীলতা তৈরি হয়।*

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরটি লিখুন।

১. অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বলতে বুঝায়-
ক) বিদ্যমান সম্পদের যথেচ্ছ ব্যবহার;
খ) সীমিত সম্পদের যৌক্তিক ব্যবহারের মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করা;
গ) বিদেশী সাহায্য ব্যবহারের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়া;
ঘ) কোন নিদির্ষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুপস্থিতিতে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের চেষ্টা করা।

২. সুষ্ঠু অর্থনৈতিক পরিকল্পনার অনুপস্থিতিতে-
ক) উন্নয়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হয়;
খ) রাষ্ট্রীয় সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার সম্ভব হয় না;
গ) দরিদ্র রাষ্ট্র সমূহের উন্নয়নে গতি আসে;
ঘ) দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব হয়।

৩. অর্থনৈতিক পরিকল্পনার ফলে-
ক) রাষ্ট্রের বিদ্যমান বৈষম্য হ্রাস করা সম্ভব;
খ) জনগণের প্রতি রাষ্ট্রের কোন দায়িত্ব থাকে না;
গ) দরিদ্র রাষ্ট্রগুলোর মুলধনের অভাব প্রকট হয়ে উঠে;
ঘ) সীমিত সম্পদের অপব্যবহার ঘটে।

৪ বাংলাদেশে একটি সুষম অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে-
ক) জাতীয় সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার সম্ভব হবে;
খ) রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে অস্থিতিশীল পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটবে;
গ) বিদেশী সাহায্য নির্ভরতা বৃদ্ধি পাবে;
ঘ) বাংলাদেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব বিসর্জিত হবে।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বলতে কি বুঝায়?
২. বাংলাদেশের মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যাগুলো উল্লেখ করুন।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. অর্থনেতিক পরিকল্পনার গুরুত্ব আলোচনা করুন।

উত্তরমালাঃ ১.খ, ২.খ, ৩.ক, ৪.ক।

সহায়ক গ্রন্থ

১. *বিমল রায়, 'অর্থবিজ্ঞান ও পরিকল্পনার রূপরেখা' (কলিকাতা);১৯৯৮*

পাঠ-৩

বাজেট
Budget

উদ্দেশ্য
এ পাঠ শেষে আপনি —

- বাজেট কি তা আলোচনা করতে পারবেন।
- বাজেটের প্রকারভেদ বর্ণনা করতে পারবেন।
- সরকারের দায়বদ্ধতা এবং বাজেটের মধ্যে সম্পর্ক উল্লেখ করতে পারবেন।

বাজেট
ধারণা করা হয়, ১৭৩৩ সাল থেকে অর্থনীতি শাস্ত্রে বাজেট শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে আসছে। সে বছরই তৎকালীন ব্রিটিশ অর্থমন্ত্রী কমন্স সভায় সর্ব প্রথম বাজেট পদ্ধতির গোড়াপত্তন করেন। ফরাসী শব্দ 'Bougette' থেকে 'বাজেট' শব্দটির উৎপত্তি। এর বাংলা অর্থ দাঁড়ায় **'থলে'**। পূর্বোক্ত অর্থমন্ত্রী অর্থসংক্রান্ড় কাগজ পত্র একটি ব্যাগ বা থলে ভর্তি করে অনুমোদনের জন্য ব্রিটিশ পার্লামেন্টে উপস্থিত হতেন। সে থেকেই বাজেট শব্দটি ব্যবহার করা হচ্ছে। বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ বিভিন্ন ভাবে বাজেটকে সংজ্ঞায়িত করেছেন। যেমন **অধ্যাপক টেইলর (Taylor)** এর মতে বাজেট হচ্ছে সরকারের বিশদ আর্থিক পরিকল্পনা (Master financial plan of a goverment)। অন্যদিকে অধ্যাপক জন. **এফ.ডিউ** (John F. Due) এর ব্যাখ্যা মতে, বাজেট বলতে বুঝায় এমন একটি আর্থিক পরিকল্পনা যা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য গৃহীত (A budget is a financial plan for a specified period of time)। সরকারের যেসব নীতিমালা, উদ্দেশ্য এবং অগ্রাধিকার থাকে সেগুলোকে বাজেটের মাধ্যমেই বিভিন্ন কার্যক্রমে রূপান্তরিত করা হয়। তাছাড়াও বাজেটের দ্বারা, এসমস্ত কার্যক্রমের জন্য প্রয়োজনীয় খরচ ও উপাদানের হিসাব প্রদান করা হয় এবং এদের ব্যবস্থাপনা ও বাস্তবায়নের উপায়সমূহ বর্ণনা করা হয়। একদিকে বাজেটের লক্ষ্য থাকে সময়মতো ও দক্ষতার সাথে গৃহীত কার্যক্রমসমূহের বাস্তবায়ন, অন্যদিকে একটি নির্দিষ্ট অর্থ বছরের জন্য নির্দিষ্ট হিসাব এবং কার্যক্রম বাজেটে অন্তর্ভুক্ত থাকে। একই সাথে ভবিষ্যতের জন্য অনেক ইঙ্গিত, পূর্বাভাস এবং সম্ভাবনার নির্দেশও বাজেটে সংযুক্ত করা হয়। অন্যদিকে জাতীয় অর্থনীতির ভারসাম্য বজায় রাখা এবং সম্পদ বিতরণে প্রভাব খাটানোর ক্ষেত্রেও বাজেট ভূমিকা রাখে। বর্তমানকালে জনগণের প্রতি সরকারের দায়বদ্ধতা, স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতার বোধকে একটি উত্তম বাজেটের অন্যতম পূর্বশর্ত হিসাবে গণ্য করা হয়।

বর্তমান কালে জনগনের প্রতি সরকারের দায়বদ্ধতা, স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতার বোধকে একটি উত্তম বাজেটের অন্যতম পূর্বশর্ত হিসাবে গন্য করা হয়।

বাজেটের প্রকারভেদ
রাজস্ব বাজেট ও উন্নয়ন বাজেট: আয় ব্যয়ের প্রকৃতির দৃষ্টিকোন থেকে বিবেচনা করে যে কোন বাজেটকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যথা- ক) রাজস্ব বাজেট খ) মুলধন বা উন্নয়ন বাজেট। যে বাজেটে সরকারী দৈনন্দিন বা চলতি আয়-ব্যয়ের হিসাব উলে-খ করা হয় তাই রাজস্ব বাজেট। আয় খাতে উলে-খ থাকে- সরকারের সম্ভাব্য আয়ের পরিমাণ এবং আয়ের খাত সমূহ। অন্যদিকে ব্যয় খাতে সরকারের সম্ভাব্য ব্যয়ের পরিমাণ এবং ব্যয়ের খাত সমূহ উল্লেখ করা হয়। প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ কর এবং বিভিন্ন রকম শুল্ক আরোপের মাধ্যমে রাজস্ব বাজেটের আয় সংগ্রহ করা হয়। যেমন- আয়কর, আমদানি কর, বিক্রয় কর, মূল্য সংযোজন কর, সম্পত্তি কর, স্ট্যাম্প, প্রমোদ কর প্রভৃতি। রাজস্ব খাতের এই ব্যয় বেসামরিক প্রশাসন, প্রতিরক্ষা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা প্রভৃতি খাতে ব্যয় করা হয়।

পক্ষান্তরে দেশের উন্নয়নমূলক বাজেটের জন্য আয় ব্যয়ের হিসাব সম্বলিত বাজেট হচ্ছে মূলধনী বাজেট বা উন্নয়ন বাজেট। প্রতিটি সরকারকেই বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী প্রণয়ন করতে হয়। এজন্য -এর সম্ভাব্য ব্যয়ের পরিমাণ ধার্য করা হয়। উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ কিভাবে সংগৃহীত হবে উন্নয়ন বাজেটের সে সংক্রান্ত নির্দেশনা থাকে। বাংলাদেশের মত গরীব রাষ্ট্রে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক উভয় উৎসই উন্নয়ন বাজেটের অর্থ সংস্থানে ব্যবহৃত হয়। বাংলাদেশ উন্নয়ন বাজেটের অর্থ সংগ্রহের জন্য বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই বৈদেশিক ঋণ এবং সাহায্যের উপর নির্ভরশীল।

সুষম বাজেট ও অসম বাজেট: আয় ব্যয়ের সমতার দৃষ্টিকোন থেকে বিবেচনা করে বাজেটকে নিম্নলিখিত ছক অনুযায়ী ভাগ করা যায়

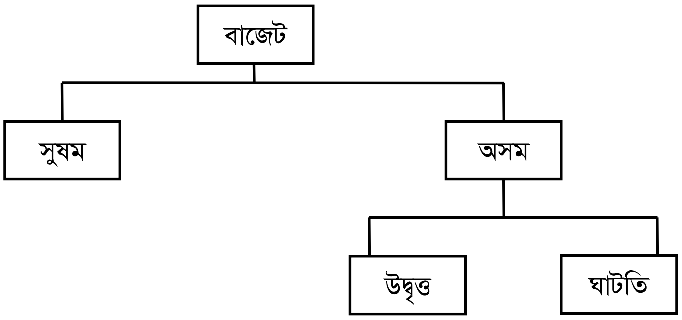

- যদি কোন বাজেটে নির্দিষ্ট অর্থ বছরে সম্ভাব্য আয় এবং ব্যয়ের পরিমাণ সমান হয় তবে সে বাজেটকে সুষম বাজেট বলা হয়।
- যদি কোন বাজেটে নির্দিষ্ট অর্থ বছরে সম্ভাব্য আয় এবং ব্যয়ের পরিমাণে সমতা না থাকে, তবে সে বাজেটকে অসম বাজেট বলা হয়।

অসম বাজেটের ক্ষেত্রে

- সম্ভাব্য আয়ের পরিমাণ যদি ব্যয়ের পরিমাণ অপেক্ষা বেশী হয়, তবে সে বাজেট 'উদ্বৃত্ত বাজেট।'
- সম্ভাব্য ব্যয়ের পরিমাণ যদি আয়ের পরিমাণ অপেক্ষা বেশী হয়, হলে সে বাজেট - 'ঘাটতি বাজেট'।

সরকারের দায়বদ্ধতা এবং বাজেট

সাম্প্রতিক সময়কালে সরকারী কর্মসূচী এবং কার্যক্রমে দায়বদ্ধতার বোধ কতটা স্পষ্ট, সেই নিরীখে একটি সরকার কতটা গণতান্ত্রিক তা মূল্যায়ন করা হয়। প্রতিটি সরকারকেই বাৎসরিক আয় ব্যয়ের হিসাব প্রদান এবং রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির পরিচালনা ও দিক নির্দেশনার জন্য বাজেট পেশ করতে হয়। অর্থ কি ভাবে সংগৃহীত হবে এবং সংগৃহীত অর্থ কিভাবে ব্যয় করা হবে সে সংক্রান্ত নির্দেশনা - প্রতিটি বাজেটেই উপস্থিত থাকে। এ সমস্ত নির্দেশনাগুলো থেকে সরকার জনগণের প্রতি কতটা দায়বদ্ধ সেই সংক্রান্ড় ধারণা পাওয়া যায়। জনগণের অর্থ জনগণের কল্যাণে ব্যয় করাই হচ্ছে দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করার অন্যতম শর্ত। বাজেটের মাধ্যমে রাজস্ব আয় বৃদ্ধির প্রচেষ্টা, সামাজিক খাতের বিকাশে সৃজনশীল উদ্যোগ, শিক্ষাখাত বিকাশের চেষ্টা কিংবা প্রয়োজনীয় খাত সমূহে ভর্তুকি প্রদানের মাধ্যমে অবস্থার উন্নতি ঘটানোর উদ্যোগের মাধ্যমে দায়বদ্ধতা প্রমান করা সম্ভব। অন্যদিকে অনুৎপাদনশীল এবং সাধারণ জনগণের স্বার্থ পরিপন্থী খাতে ব্যয় বরাদ্দ করা হলে তা জনগণের প্রতি সরকারের দায়বদ্ধতা প্রমাণ করে না। গণতান্ত্রিক সরকার বলতে বুঝানো হয় যে সরকার জনগণ দ্বারা নির্বাচিত এবং সার্বক্ষণিকভাবে জনগণের কল্যাণে নিয়োজিত থাকে। বাজেট উপস্থাপনের মাধ্যমে সরকার শুধু বাৎসরিক আয় ব্যয়ের হিসাব তুলে ধরে না, একই সাথে অর্থনীতি সংক্রান্ত সরকারী চিন্তা ভাবনাও প্রকাশিত হয়। এ জন্যই বিভিন্ন খাতে ব্যয় বরাদ্দ যাচাই করে বুঝা যায় সরকার কোন খাতকে কতটা গুরুত্ব প্রদান করছে। পূর্ববর্তী বছরের সাথে নির্দিষ্ট অর্থ বছরে বিভিন্নখাতে বরাদ্দকৃত ব্যয়ের হ্রাস বৃদ্ধি পর্যবেক্ষণ করেও সরকারের দায়বদ্ধতা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যেতে পারে। বাজেট একটি রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক প্রতিচ্ছবি। সরকার রাষ্ট্রের জনগণের জন্য কি করছেন এবং কিভাবে করছেন তার ধারণা বাজেটের মাধ্যমে পাওয়া যায়। এ জন্যই জনগণের প্রতি সরকারের দায়বদ্ধতা প্রমাণ করতে হলে বাৎসরিক বাজেটকেও জনগণের স্বার্থানুকুলে তৈরী করতে হয়।

বাংলাদেশের মত গরীব রাষ্ট্রে অভ্যন্তরীন ও বৈদেশিক উভয় উৎসই উন্নয়ন বাজেটের অর্থ সংস্থানে ব্যবহৃত হয়।

জনগনের অর্থ জনগণের কল্যাণে ব্যয় করাই হচ্ছে দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করার অন্যতম শর্ত।

***সারকথা :** সরকারের যে সব নীতিমালা, উদ্দেশ্য এবং অগ্রাধিকার থাকে সেগুলোকে বাজেটের মাধ্যমেই বিভিন্ন কার্যক্রমে রূপান্তরিত করা হয় এবং এ জন্যে প্রয়োজনীয় খরচ ও উপাদানের হিসাব প্রদান করা হয়। একটি উত্তম বাজেটের পূর্বশর্ত হলো জনগণের প্রতি সরকারের দায়বদ্ধতা, স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতার বোধ। বাজেটে জনগণের অর্থ জনগণের কল্যাণে ব্যয় করার মধ্যদিয়ে সরকারের দায়বদ্ধতা প্রমাণিত হয়। সরকার জনগণের জন্যে কি করছে এবং কিভাবে করছে বাৎসরিক বাজেট থেকে তার ধারণা পাওয়া যায়। জনমুখী বাজেট তৈরি করে সরকারের গণতান্ত্রিক মানসিকতা এবং দায়বদ্ধতা প্রমাণ করা যায়।*

পাঠোত্তর মুল্যায়ন
নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন
সঠিক উত্তরটি লিখুন।

১। অধ্যাপক জন .এফ.ডিউ-র মতানুসারে বাজেট বলতে বুঝায়-
ক) কোন নিদির্ষ্ট অর্থ বছরের জন্য হিসাব বিহীন অর্থের ব্যবস্থা করা;
খ) এক বছরে বিদেশ থেকে প্রাপ্ত অর্থের হিসাব প্রদান করা;
গ) জনগণের উপর অধিক পরিমাণে কর ধার্য করা;
ঘ) এমন একটি আর্থিক পরিকল্পনা যা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য গৃহীত।

২। বর্তমান কালে উত্তম বাজেটের অন্যতম পূর্বশর্ত হিসাবে গণ্য হয়-
ক) সরকারের দায়বদ্ধতা, স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতার বোধ;
খ) জনগণকে সরকারী কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত না করা;
গ) জীবনযাত্রা ব্যয় বৃদ্ধি করা;
ঘ) নির্বাচনে জয় নিশ্চিত করা।

৩। দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করার অন্যতম শর্ত-
ক) জনগণের অর্থ জনগণের জন্য ব্যয় করা;
খ) সকল দূরাবস্থার জন্য জনগণকে দায়ী করা;
গ) জনগণকে সরকারের বাধ্য করে তোলা;
ঘ) জনগণ এবং সরকারের মধ্যে কোন সম্পর্ক না থাকা।

৪। গণতান্ত্রিক সরকার বলতে বুঝানো হয়-
ক) গণতন্ত্রের নামে যে সরকার পরিচালিত হয়;
খ) মুষ্টিমেয় ব্যক্তির স্বার্থে পরিচালিত সরকার;
গ) ক্ষমতা দখলকারী সরকার;
ঘ) জনগণের দ্বারা নির্বাচিত এবং সার্বক্ষণিকভাবে জনকল্যাণে নিয়োজিত সরকার।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন
১। রাজস্ব বাজেট এবং উন্নয়ন বাজেট বলতে কি বোঝায়?
২। সরকারের দায়বদ্ধতা কি?

রচনামূলক প্রশ্ন
১. বাজেটের সাথে সরকারের দায়বদ্ধতার সম্পর্ক আলোচনা করুন।

উত্তরমালা : ১.ঘ, ২.ক, ৩.ক, ৪.ঘ।

সহায়ক গ্রন্থ
Azizur Rahrnan Khan, The Economy of Bangladesh, London,: Macmillan, 1972

মিশ্র ও মুক্ত বাজার অর্থনীতি

পাঠ-৪

Mixed and Free Market Economy

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি —

- মিশ্র অর্থনীতির সংজ্ঞা এবং এ অর্থনীতির বৈশিষ্ট্যসমূহ বলতে পারবেন।
- মুক্তবাজার অর্থনীতির সংজ্ঞা এবং বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।
- বাংলাদেশে অনুসৃত মুক্তবাজার অর্থনীতি ব্যবস্থা সম্পর্কে মন্তব্য করতে পারবেন।

মিশ্র অর্থনীতি

অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হিসাবে দু'টি মতাদর্শ পৃথিবীতে সর্বাধিক প্রচলিত-পুঁজিবাদ এবং সমাজতন্ত্র। দীর্ঘদিন যাবৎ বিভিন্ন রাষ্ট্রসমূহের অভিজ্ঞতা থেকে প্রমাণিত হয় যে, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হিসাবে পুঁজিবাদ অথবা সমাজতন্ত্র উভয়ের কোনটিই এককভাবে শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করতে পারে না। উভয় ব্যবস্থার মধ্যেই গুরুতর অসামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয়। রাষ্ট্রীয় মালিকানায় এবং রাষ্ট্রীয় নির্দেশনায় অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রচেষ্টা পৃথিবীর অধিকাংশ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রেই সফল হয় নি। ৯০'র দশকে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোর পতনের কারণ হিসাবে জনগণের অর্থনৈতিক দুর্দশাকে চিহ্নিত করা যায়। অন্যদিকে পুজিঁবাদী অর্থনীতিতে ব্যক্তিগত মালিকানা ব্যবস্থায় শুধুমাত্র মুনাফালাভের প্রবণতার ফলে সাধারণ জনগণের জীবন যাপনের সমস্যা বাড়তে থাকে। এমতাবস্থায় প্রকৃত উন্নয়ন বাস্তবায়িত হয় না। পুঁজিবাদী এবং সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার দুর্বলতাগুলো থেকে মুক্ত হবার জন্য যে অর্থনীতিতে সরকারী উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারী উদ্যোগকেও সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়া হয় তাকেই মিশ্র অর্থনীতি নামে অভিহিত করা যায়। বর্তমানকালে বহু রাষ্ট্রেই বিশেষত: উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলো দ্রুত উন্নয়নের জন্য মিশ্র অর্থনীতি ব্যবস্থা অনুসরণ করে। এতে যদিও পরিকল্পনাসমূহ সরকারী উদ্যোগেই প্রণীত হয় তবে ব্যক্তিগত এবং রাষ্ট্রীয়খাত একে অপরের সহায়ক হিসাবে কাজ করে।

যে অর্থনীতিতে সরকারী উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারী উদ্যোগকেও সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়া হয় তাকেই মিশ্র অর্থনীতি নামে অভিহিত করা যায়।

মিশ্র অর্থনীতিতে, উৎপাদনের যে সব ক্ষেত্রে অধিক মূলধন ও দীর্ঘ সময় প্রয়োজন এবং মুনাফার হার কম থাকে সে সব ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় বা সরকারী উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। অন্যদিকে যে সব খাতে স্বল্প মুলধন ও স্বল্প সময় প্রয়োজন এবং অধিক মুনাফার আশা করা হয়- সে গুলোর ক্ষেত্রে বেসরকারী উদ্যোগের জন্য উপযুক্ত হিসাবে বিবেচনা করা হয়।

মিশ্র অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য

- রাষ্ট্রীয় এবং ব্যক্তিগত খাতের সহাবস্থান;
- মুনাফা এবং সেবা প্রদান-উভয় ব্যবস্থার স্বীকৃতি;
- মূল্য ব্যবস্থার হ্রাস-বৃদ্ধিতে সরকারের ভূমিকা;
- ভোগকারীর স্বাধীনতা।

মুক্ত বাজার অর্থনীতি হচ্ছে সেই অর্থনীতি ব্যবস্থা যেখানে ব্যক্তি মালিকানা এবং ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদকে স্বীকার করা হয়।

মুক্তবাজার অর্থনীতি

মুক্তবাজার অর্থনীতি এবং উদার গণতান্ত্রিক পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক রয়েছে। মুক্ত বাজার অর্থনীতি হচ্ছে সেই অর্থনীতি যেখানে ব্যক্তি মালিকানা এবং ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদকে স্বীকার করা হয়। মুক্ত বাজারের ধারণা একদিনে গড়ে উঠে নি। বিভিন্ন দার্শনিক এবং অর্থনীতিবিদের চিন্তা ভাবনার মধ্য দিয়েই এই ধারণা পরিপুষ্টি লাভ করেছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে- দার্শনিক জনলকের ব্যক্তিগত সম্পত্তি বিষয়ক তত্ত্ব, সমাজ বিজ্ঞানী হারবার্ট স্পেনসারের ব্যক্তি স্বাতন্ত্রবাদ দর্শন, গণতন্ত্রী জন স্টুয়ার্ট মিলের অর্থনীতি ক্ষেত্রে ব্যক্তির ভুমিকাই প্রধান শীর্ষক দর্শন এবং এড্যাম স্মিথের অবাধ বাণিজ্য (Laissez faire) নীতি।

মুক্তবাজার অর্থনীতির ধারণায়, মনে করা হয়- সামাজিক কল্যাণের জন্য রাষ্ট্র নয় বরং মুক্ত মানুষই অধিক উপযুক্ত। বাজার অর্থনীতিতে জিনিষের মূল্য, উৎপাদনের পরিমাণ এবং ব্যক্তির উপার্জন নির্ধারিত হয় এমনভাবে যাতে ব্যক্তি বিশেষের একক ভূমিকা এবং রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ থাকে না বরং বাজার ব্যবস্থাই মূল ভূমিকা পালন করে। চাহিদা এবং যোগান এ দুটি শক্তির মাধ্যমে বাজার প্রভাবিত হয়। মুক্ত বাজার অর্থনীতিতে ব্যক্তির উপযোগ বা সন্তুষ্টিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়া হয়। ১৯৮০'র দশক থেকে মূলত: বিশ্বব্যাংক এবং আই.এম.এফ.-এর উদ্যোগে তৃতীয় বিশ্বজুড়ে অবাধ বাজার অর্থনীতি প্রতিষ্ঠার বিষয়টি গুরুত্ব লাভ করে । ৯০'র দশকে সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শের পতন তথা রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতির ব্যর্থতার পরিপ্রেক্ষিতে কয়েকটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যতীত সমগ্র বিশ্বব্যাপী মুক্ত বাজার অর্থনীতির প্রসার ঘটেছে।

১৯৮০'র দশক থেকে মূলত: বিশ্বব্যাংক এবং আই.এম.এফ.-এর উদ্যোগে তৃতীয় বিশ্বজুড়ে অবাধ বাজার অর্থনীতি প্রতিষ্ঠার বিষয়টি গুরুত্ব লাভ করে ।

মুক্ত বাজার অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য

- লেন-দেনের জন্য স্বাধীনতা ও বাজার এর গুরুত্ব;
- ব্যক্তিগত সম্পত্তির স্বীকৃতি;
- মুক্তবাজার অর্থনীতি ব্যক্তিস্বার্থ নির্ভর বিধায় এ অর্থনীতিতে প্রতিযোগিতার উৎপত্তি হয় এবং প্রতিযোগিতার ফলে সর্বনিম্ন দরে দ্রব্য ও সেবার উৎপাদনে নিশ্চয়তা আসে;
- ভোক্তার সার্বভৌমত্ব নিশ্চিত হয়। তারা নিজেদের পছন্দ মোতাবেক দ্রব্য সামগ্রী ক্রয় করতে পারে;
- মুক্তবাজার অর্থনীতির ফলে আমদানী ব্যয় এবং রপ্তানী আয় বৃদ্ধি পায়;
- ভুর্তুকি, কর-রেয়াত ইত্যাদি না থাকার ফলে রাষ্ট্রের অর্থ-সাশ্রয় হয়।

বাংলাদেশ এবং মুক্তবাজার অর্থনীতি

১৯৮০'র দশক থেকে বিশ্বব্যাংক এবং আই. এম.এফ. তৃতীয় বিশ্বের ৭৬ টি দেশে কাঠামো পুর্নবিন্যাস সংস্কার কর্মসুচী চালু করে। এই কর্মসূচীর আওতায় এ সব দেশকে অবাধ বাজারমুখী সংস্কার কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য ১৯৮০ থেকে ১৯৯১ সময়কালে ৪১০০ কোটি ডলারের ২৫৮টি ঋন প্রদান করা হয়। বাংলাদেশও এই কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত। স্বাধীনতা পরবর্তী কালে প্রথম সরকারের সময়ে পরিকল্পিত অর্থনীতির আওতায় অর্থনৈতিক রাষ্ট্র পরিচালিত হতে থাকে। পরবর্তী সরকারগুলো রাষ্ট্রীয় খাতের পরিবর্তে বেসরকারী খাতকে গুরুত্ব প্রদান করে এবং বেসরকারী খাতকে বিকশিত করার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় পরবর্তীতে মুক্তবাজার মতাদর্শকে বাংলাদেশের অর্থনীতি পরিচালনায় প্রাধান্য দেয়া হতে থাকে। এছাড়াও বাংলাদেশের বৃহৎ রাজনৈতিক শক্তিগুলোও বাজার অর্থনীতির পক্ষে অবস্থান নিয়েছে। ৯০'র দশকে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার পতনও বাজার অর্থনীতি কেন্দ্রিক ব্যবস্থা গ্রহণকে শক্তিশালী সমর্থন যোগায়। বর্তমানে বাংলাদেশে যে সব কারণে মুক্ত বাজার অর্থনীতি চর্চা করা হচ্ছে তার কারণগুলো নিম্নরূপ:

অনেকে মনে করেন মুক্তবাজার অর্থনীতির নামে বাংলাদেশের পুঁজি দেশের বাইরে চলে যাচ্ছে, এদেশে বিদেশী পণ্যের বাজারে পরিণত হচ্ছে।

- মুক্ত বাজার অর্থনীতির ফলে রাষ্ট্রীয় খাতের ক্রমাগত লোকসান বন্ধ হবে;
- কাঠামোগত সংস্কার সাধনের ফলে প্রশাসনে স্বচ্ছতা ও গতিশীলতা আসবে এবং সরকারের ব্যয় কমবে;
- প্রতিযোগিতামূলক ব্যবস্থার কারণে পণ্যের ব্যয় কমবে;
- প্রতিযোগিতামূলক ব্যবস্থার কারণে পণ্যের মান বাড়বে এবং শ্রমিকদের দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে;
- খোলাবাজার অর্থনীতি অনুসরণ করার ফলে রপ্তানীমুখী বিভিন্ন শিল্প স্থাপিত হওয়ার ফলে বৈদেশিক আয় বৃদ্ধি করবে হবে;
- অদক্ষ এবং অযোগ্য রুগ্ন শিল্পগুলোর দায়দায়িত্ব সরকারের হাতে থাকবে না। ব্যক্তিমালিকানায় ছেড়ে দেয়া হলে মালিক পক্ষ ব্যক্তিগত স্বার্থেই এসব শিল্পসমূহকে পুনরুজ্জীবিত করবে।

মুক্তবাজার অর্থনীতির পক্ষে বিভিন্ন যুক্তি উপস্থাপন করা হলেও বিভিন্ন গবেষণা থেকে দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশসহ তৃতীয় বিশ্বের বিভিন্ন দেশেই মুক্ত বাজার অর্থনীতি চর্চার দ্বারা তেমন উন্নয়ন সাধিত হয়নি। বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ রেহমান সোবহান এক গবেষণায় প্রমাণ করেছেন, মুক্তবাজার অর্থনীতির দ্বারা তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্রগুলোতে সামগ্রিকভাবে স্থায়ী বিনিয়োগ এবং রপ্তানী প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয় নি এবং মুদ্রাস্ফীতি রোধ করা যায় নি। এছাড়াও অনেকে মনে করেন মুক্তবাজার অর্থনীতির নামে বাংলাদেশের পুঁজি দেশের বাইরে চলে যাচ্ছে, এদেশে বিদেশী পণ্যের বাজারে পরিণত হচ্ছে।

সারকথা: *ব্যক্তিগত মালিকানা এবং ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদকে অবলম্বন করে মুক্ত বাজার অর্থনীতির ধারণা গড়ে উঠেছে। এ অর্থনীতিতে রাষ্ট্র নয় বাজারই মূল চালিকা শক্তি হিসাবে কাজ করে। বাজারের গতি প্রকৃতি নির্ধারিত হয় চাহিদা এবং যোগান এ দু'টি শক্তি দ্বারা। বর্তমানে পৃথিবীর অধিকাংশ দেশের মত বাংলাদেশেও বাজার অর্থনীতির চর্চা চলছে। ধরে নেয়া হয়েছে এর ফলে রাষ্ট্রীয় খাতের লোকসান বন্ধ হবে, পণ্যের মান ও শ্রমিকের দক্ষতা বাড়বে। রপ্তানীমুখী শিল্প স্থাপনা হবে এবং বৈদেশিক আয় বাড়বে। কিন্তু, দু:খজনক হলেও সত্য তৃতীয় বিশ্বের অন্য অনেক দেশের মত বাংলাদেশেও বাজার অর্থনীতির তেমন কোন সুফল অর্জিত হয় নি।*

পাঠোত্তর মুল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরটি লিখুন।

১. মুক্ত বাজার অর্থনীতিতে মনে করা হয়-
ক) অর্থনীতিতে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ সর্বোত্তম;
খ) ব্যক্তির উপযোগ বা সন্তুষ্টি প্রাধান্য দেওয়ার বিষয় নয়;
গ) ব্যক্তিমালিকানা এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ অপকারী;
ঘ) সামাজিক কল্যাণের জন্য রাষ্ট্র নয় বরং মানুষই অধিক উপযুক্ত

২। মুক্ত বাজার অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য-
ক) ভোক্তার সার্বভৌমত্ব;
খ) ব্যক্তির স্বেচ্ছাচারিতা;
গ) অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব;
ঘ) রাষ্ট্রের স্বেচ্ছ্যাচারিতা।

৩. মুক্তবাজার অর্থনীতির ফলে-
ক) পণ্যের মান বাড়বে এবং শ্রমিকদের দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে;
খ) বাংলাদেশ পাঁচ বছরের মধ্যে উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত হবে;
গ) রাষ্ট্রীয় খাতে ব্যয় বাড়তে থাকবে;
ঘ) অর্থনীতিতে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ বাড়বে।

৪. রেহমান সোবাহানের মতে, মুক্ত বাজার অর্থনীতি দ্বারা-
ক) তৃতীয় বিশ্বের ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হয়েছে;
খ) ধনী রাষ্ট্রগুলো ঋণগ্রস্ড় হয়ে পড়েছে;
গ) অর্থনৈতিক স্থায়ী বিনিয়োগ এবং রপ্তানী প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয় নি;
ঘ) বাংলাদেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হয়েছে।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. মুক্ত বাজার অর্থনীতির বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ করুন।
২. মিশ্র অর্থনীতি বলতে কি বোঝায়?

রচনামুলক প্রশ্ন

১. বাংলাদেশের মুক্ত বাজার অর্থনীতি ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করুন।

উত্তরমালাঃ ১.ঘ, ২.ক, ৩.ক, ৪.গ

সহায়ক গ্রন্থ

১. *হাসনাত কবীর কলে-াল (সম্পাদিত)' বাজার অর্থনীতি' ঢাকা, (১৯৯৭)*

বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থা

পাঠ-৫

Global Economic System

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি —

- স্নায়ু যুদ্ধ কালীন বিশ্ব ব্যবস্থা ও স্নায়ু যুদ্ধের সমাপ্তির কারণ বর্ণনা করতে পারবেন।
- বর্তমান বিশ্বের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

¯œায়ু যুদ্ধকালীন বিশ্বব্যবস্থা

অষ্টাদশ শতকে ইউরোপে যন্ত্রবিপ্লব সংগঠিত হয়। এর ফলে আধুনিক শিল্প বাণিজ্যভিত্তিক অর্থনীতি তথা ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার যাত্রা শুরু হয়। ঐতিহাসিকভাবে অনুসন্ধান করলে দেখা যায়, প্রথম পর্বে ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, হল্যান্ড ও বেলজিয়াম, দ্বিতীয় পর্বে আমেরিকা, জার্মানী, কানাডা এবং তৃতীয় পর্বে জাপান ও কয়েকটি এশীয় দেশে ধনতন্ত্রের বিকাশ ঘটে। এ সব দেশগুলো উপনিবেশ স্থাপন এবং অনুন্নত দেশে পুঁজি বিনিয়োগ ও অনুকূল বাণিজ্য ভারসাম্য বজায় রেখে নিজেদের অবস্থার ক্রমাগত উন্নতি ঘটায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে ইউরোপের অর্থনীতি বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে। অপরদিকে যুদ্ধ কালে নিরাপদ অবস্থানের ফলে ব্যাপক উৎপাদন বৃদ্ধি এবং বাণিজ্য সম্প্রসারণ দ্বারা আমেরিকা ধনতান্ত্রিক বিশ্বের প্রধান শক্তিতে পরিণত হয়।

অন্যদিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্য দিয়ে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের নেতৃত্ব লাভ করে। বিশেষত: জোসেফ স্ট্যালিনের সময়ে নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতি ব্যবস্থার সাফল্যজনক প্রয়োগের ফলে সোভিয়েত ইউনিয়নের অর্থনীতি বিকশিত হয়। আমেরিকার নেতৃত্বাধীন ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির বিপরীতে সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রভাবিত সমাজতান্ত্রিক বলয় গড়ে উঠে। সামরিক - অর্থনৈতিক - রাজনৈতিক সকল ক্ষেত্রেই মতাদর্শিক দ্বন্দ্ব প্রবল হতে থাকলে স্নায়ু যুদ্ধের সূচনা হয়। সমগ্র বিশ্বের রাষ্ট্রসমূহ আমেরিকা এবং সোভিয়েত ইউনিয়নকে কেন্দ্র করে দু'টি ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। এমন কি জোট নিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলো পরোক্ষভাবে হলেও কোন এক পক্ষ সংশি- ষ্ট হতে বাধ্য হয়। এই বিশ্ব ব্যবস্থাকে দ্বি-মেরু প্রবণ (bi-polar) বিশ্ব ব্যবস্থা নামে অভিহিত করা হয়। স্নায়ু-যুদ্ধ চলাকালে উত্তেজক রাজনৈতিক বক্তব্য এবং দ্বন্দ্বের ফলে সামরিক ব্যয় বৃদ্ধি পায়। ন্যাটো (NATO) এবং **ওয়ারশ** (WARSAW)'র মত সামরিক জোট গঠিত হয়। এমতাবস্থায় শান্তিপ্রিয় বিশ্ববাসীর মধ্যে পারমাণবিক ধ্বংস যজ্ঞের ফলে মানব সভ্যতা লুপ্ত হবে, এমন আশংকা তৈরী হয়। আশির দশক পর্য¯œায়ূ যুদ্ধের উত্তেজনা চলতে থাকে।

সামরিক - অর্থনৈতিক - রাজনৈতিক সকল ক্ষেত্রেই মতাদর্শিক দ্বন্দ্ব প্রবল হতে থাকলে ¯œায়ু যুদ্ধের সূচনা হয়।

¯œায়ুযুদ্ধ সমাপ্তি

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে স্নায়ুযুদ্ধের ফলে সমগ্র বিশ্বব্যাপী যে আতঙ্কজনক পরিস্থিতি তৈরী হয়, ৮০ দশকের শেষ দিকে এসে তা হ্রাস পায়। মিখাইল গর্বাচেভ ১৯৮৫ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার পর 'গ্লাসনষ্ট' এবং 'পেরেস্ড্রইকা' কর্মসুচী গ্রহণ করেন। এর ফলে সোভিয়েত সমাজে ব্যাপক পরিবর্তন সূচিত হয়। কম্যুনিষ্ট পার্টির একচেটিয়া ক্ষমতা চর্চা খর্ব হতে থাকে। পার্টির ভিতরে এবং বাইরে সমালোচনার পরিবেশ তৈরী হয়। সেই সাথে বর্হিবিশ্বের সাথে যোগাযোগের মাত্রাও বাড়তে থাকে। এসবের ফলশ্রুতিতে সোভিয়েত ইউনিয়নসহ সমগ্র পূর্ব ইউরোপে কম্যুনিজম বিরোধী আন্দোলন দানা বাঁধতে থাকে। কয়েক বছরের মধ্যে এ অঞ্চলের রাষ্ট্রগুলোতে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার পতন ঘটে। সমাজতন্ত্রের পতনের আগেই গর্বাচেভের গৃহীত অস্ত্র হ্রাস চুক্তি সহ বিভিন্ন কর্মসূচীর ফলে পশ্চিমা ধনতান্ত্রিক বিশ্বের সাথে বৈরী সম্পর্ক হ্রাস পেতে থাকে এবং স্নায়ুযুদ্ধের তীব্রতা হ্রাস পায়। ১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার পতনের সাথে স্নায়ু-যুদ্ধ যুগেরও আনুষ্ঠানিক অবসান ঘটে। স্নায়ু-যুদ্ধ অবসান তথা রাষ্ট্রিক সমাজতন্ত্র পতনের কয়েকটি কারণ নিম্নরূপ:

কম্যুনিষ্ট পার্টির ক্ষমতা

জনগণের অধিকার সংরক্ষণের পরিবর্তে শ্রমিক শ্রেণীর দোহাই দিয়ে কম্যুনিষ্ট পাটির একচেটিয়া ক্ষমতা চর্চা জনগণকে বিক্ষুব্ধ করে তোলে। এর ফলে জল্পনা পরিবর্তনকে স্বাগত জানায়।

অর্থনৈতিক দুর্বলতা

অর্থনৈতিক কারণও এ ব্যাপারে বিশাল ভূমিকা পালন করে। ষাটের দশক থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রবৃদ্ধির হার ধীর হতে থাকে এবং সত্তরের দশকে এসে তা প্রায় স্থবির হয়ে যায়। সামরিক প্রতিযোগিতার ফলে দেশের অর্থনীতিতে বিপুল চাপ পড়ে এবং জনগণের জীবন যাত্রার মান ক্রমাগত নীচে নামতে থাকে। জনগণের মৌলিক চাহিদার যোগানও সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর জন্য সমস্যাজনক হয়ে উঠে।

ধনতান্ত্রিক বিশ্বের ভূমিকা

১৯১৭ সালে রাশিয়ায় বলশেভিক বিপ্লবের পর থেকেই ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলো সমাজতন্ত্রের পতনের জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করতে থাকে। এ জন্য সকল ধরনের অর্থনৈতিক রাজনৈতিক- তথা সামরিক চাপসৃষ্টিতে তারা সচেষ্ট ছিল। সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষে এ চাপ মোকাবেলা করা সম্ভব হয় নি। এসব কারণে সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়ন খুব দ্রুত ভেঙ্গে পড়ে। এ ছাড়া জনগণও এ পরিবর্তনকে স্বাগ জানিয়েছিল।

বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থা

পূর্ব ইউরোপ এবং সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্রের পতনের ফলে ায়ুযুদ্ধের অবসান ঘটে এবং বিশ্ব অর্থনীতির প্রকৃতি মৌলিক ভাবে পরিবর্তিত হয়। দীর্ঘকাল যাবৎ বিদ্যমান সমাজতান্ত্রিক এবং ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক বিন্যাস ভেঙ্গে যায়। এর পরিবর্তে বিশ্ব অর্থনীতিতে শুধুমাত্র ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। একে অবাধ বাজার অর্থনীতি ব্যবস্থা বলা হয়। বর্তমান বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য এখানে আলোচনা করা হলো।

আঞ্চলিক বাণিজ্য

সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির পতনের পর থেকে বিশ্ব অর্থনীতিতে আঞ্চলিক বাণিজ্য ব্যবস্থা ক্রমাগত শক্তিশালী হয়েছে। বিভিন্ন অঞ্চলের প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলো পরস্পরের সাথে বাণিজ্যের পরিমাণ উলে- খযোগ্য হারে বাড়ানোর জন্য জোট গঠনের উপর গুরুত্ব দিচ্ছে। উদাহরণ স্বরূপ, ইউরোপীয় সম্প্রদায়ের **'মাসট্রিকট চুক্তি',** উত্তর আমেরিকার তিনটি দেশ আমেরিকা,কানাডা, মেক্সিকোর গঠিত **'নাফটা'** (NAFTA) [North American Free Trade Agreement] **এবং** পূর্ব এশিয়ার **'আসিয়ান'** (ASEAN) 'র কথা উলে- খ করা যায়। আঞ্চলিক বাজার শক্তিশালী করার মাধ্যমে নিজস্ব অর্থনীতি শক্তিশালী করার ধারণা থেকেই আঞ্চলিক বাণিজ্যকে অধিক গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে।

ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র সমূহের মধ্যে দ্বন্দ্ব সমাজতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থার পতনের ফলে ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে অর্থনৈতিক বিরোধ শক্তিশালী হচ্ছে। পূর্বে সমাজতন্ত্র বিরোধিতার ফলে ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোর অর্থনৈতিক স্বার্থ একসূত্রে বাঁধা ছিলো।

বহুজাতিক কোম্পানীর প্রাধান্য

বর্তমান বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বহুজাতিক কোম্পানীগুলো ক্রমাগত প্রাধান্য অর্জন করছে।ব্যাপক বিনিয়োগ ক্ষমতা থাকার ফলে বহুজাতিক কোম্পানীগুলো জাতীয় অর্থনীতি প্রভাবিত করার ক্ষমতা অর্জন করেছে। সরকারের গৃহীত বিভিন্ন নীতি নিজেদের অনুকূলে নিয়ে আসতে সক্ষম হচ্ছে। বিশেষতঃ, দরিদ্র রাষ্ট্রগুলোতে বহুজাতিক কোম্পানীর ক্রমবর্ধমান প্রভাব জাতীয় সার্বভৌমত্বের ধারণার উপরও প্রভাব ফেলছে।

ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহের দ্বন্দ্ব

সমাজতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থার পতনের ফলে ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে অর্থনৈতিক বিরোধ শক্তিশালী হচ্ছে। পূর্বে সমাজতন্ত্র বিরোধিতার ফলে ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোর অর্থনৈতিক স্বার্থ একসূত্রে বাঁধা ছিলো। বর্তমানে এই সংহতি বিপন্ন হয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে অর্থনৈতিক স্বার্থ সংরক্ষণের প্রয়োজনে পুঁজি বিনিয়োগ ও বাজার দখলের দ্বন্দ্ব বেড়ে উঠেছে। উদাহরণ স্বরূপ আমেরিকা ও

জাপানের মধ্যে তীব্র বাণিজ্যিক মতবিরোধের উল্লেখ করা যায়। এ অবস্থাকে **'অর্থনৈতিক ঠান্ডা যুদ্ধ'** 'নামে অভিহিত করা হচ্ছে।

- ধনতান্ত্রিক বাণিজ্য যুদ্ধের - কয়েকটি উদাহরণ নিচে উল্লেখ করা হলো:
- জাপানের সাথে আমেরিকার বার্ষিক বাণিজ্য ঘাটতির পরিমাণ ৫ হাজার ৯ শত কোটি ৩০ লাখ মার্কিন ডলার;(১৯৯৩সাল)
- ইউরোপের মধ্যে জার্মানীর অর্থনৈতিক অবস্থা সবচেয়ে শক্তিশালী। জার্মানীর জি.ডি.পি র পরিমাণ ফ্রান্স ও ব্রিটেনের সম্মিলিত জি.ডি.পি.র প্রায় সমান (১৯৮৮ সাল)
- ইইসিতে যুক্তরাষ্ট্রের বিনিয়োগ থেকে যুক্তরাষ্ট্রে ইইসি'র বিনিয়োগ ৩০০০ কোটি ডলার বেশী, (১৯৯২সাল) এমতাবস্থায় দেখা যাচেছ যে, নতুন অর্থনৈতিক বিশ্বব্যবস্থায় একদিকে উন্নত ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে স্বার্থের দ্বন্দ্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে। অন্যদিকে, উন্নত বনাম অনুন্নত ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোর অর্থনৈতিক কার্যক্রমে অনুন্নত বিশ্বের স্বার্থ রক্ষিত হচ্ছে না।
- ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও ইউরো : ১৯৫৭ সালে রোম চুক্তি অনুসারে ১৯৫৮ সালে ইউরোপীয়ান কমিশন গঠিত হয়। তারই ধারাবাহিকতায় ১৯৯৫ সালের ১লা জানুয়ারি ইউরোপীয় ইউনিয়নের (আন্‌ভুর্ক্ত দেশগুলোর) পারস্পরিক স্বার্থে উল্লেখযোগ্য হারে শুল্ক হ্রাসের মাধ্যমে নিজেদের উৎপাদিত পণ্যের জন্যে সুলভ ও সাধারণ বাজার সৃষ্টি এবং বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে ই.ইউ গঠিত হয় এবং এর বর্তমান সদস্য সংখ্যা ১৫। ১৯৯৯ সালের ১লা জানুয়ারি থেকে সদস্যভুক্ত ১১টি দেশে একক মুদ্রা 'ইউরো' চালু হয়েছে। ই.ইউ এবং 'ইউরো' বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রাখবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। ভবিষ্যতে বিশ্ব রাজনীতিতেও ই.ইউ'র ব্যাপক ভূমিকা থাকবে।

সারকথা: *দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পুঁজিবাদ এবং সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শের লড়াইয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নকে কেন্দ্র করে বিশ্ব দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে এবং পরবর্তীতে স্নায়ু যুদ্ধের সূচনা হয়। নব্বুই'র দশকে রাষ্ট্রিক সমাজতন্ত্রের পতন হলে স্নায়ুযুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে। সে সাথে নতুন ধরনের বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থার আবির্ভাব হয়। আঞ্চলিক বাণিজ্য, বহুজাতিক কোম্পানীর প্রাধান্য, ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহের দ্বন্দ, ইউরোপ মহাদেশে একক মুদ্রার প্রচলন ইত্যাদি এ অর্থ ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য।*

পাঠোত্তর মুল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরটি লিখুন।

১. স্নায়ূ যুদ্ধে বিবদমান পক্ষ ছিল-

ক) ধনতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্র;

খ) মৌলবাদ এবং ধনতন্ত্র;

গ) সামরিকতন্ত্র এবং একনায়কতন্ত্র;

ঘ) সামন্ততন্ত্র এবং পুঁজিবাদ।

২. রাশিয়ায় বলশেভিক বিপ্লব সম্পন্ন হয়-

ক) ১৯১৯;

খ) ১৯৫০;

গ) ১৯১৭;

ঘ) ১৮৮৫;

৩. নাফটা (NAFTA) গঠন করেছে।

ক) বাংলাদেশ,ভারত, পাকিস্থান;

খ) জার্মানী, ফ্রান্স,ইংল্যান্ড;

গ) মালদ্বীপ, ভূটান, নেপাল;

ঘ) আমেরিকা, কানাডা, মেক্সিকো।

৪. ইউরোপের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী অর্থনীতি

ক) জার্মান;

খ) গ্রীস;

গ) ইংল্যান্ড;

ঘ) ফ্রান্স।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। অর্থনৈতিক ঠান্ডাযুদ্ধ কি?

২। ধনতান্ত্রিক বাণিজ্যযুদ্ধের কয়েকটি উদাহরণ দিন।

রচনামুলক প্রশ্ন

১. বর্তমান বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থার স্বরূপ আলোচনা করুন।

২. স্নায়ু যুদ্ধকালীন বিশ্বব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করুন। এর সমাপ্তি হয় কিভাবে?

উত্তরমালাঃ ১.ক, ২.গ, ৩.ঘ, ৪.ক।

সহায়ক গ্রন্থ

১. *মোঃ আবদুল হালিম ও ফেরদৌস হোসেন,'ায়ু-যুদ্ধোত্তর আন্তর্জাতিক রাজনীতি' (১৯৯৫)*

২. *আনু মুহাম্মদ 'ক্রান্তিকালের বিশ্ব অর্থনীতি ও উন্নয়ন সাম্রাজ্য' (১৯৯২)*